কুসুম শুয়ে আছে তার অন্ধকার ঘরে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
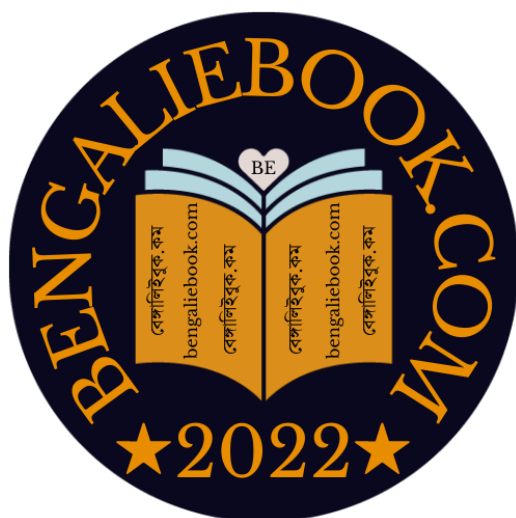
কুসুম শুয়ে আছে তার অন্ধকার ঘরে

বছর পঁচিশেক আগে গায়গাটা ছিল জলাজমি ধানের খেত অথবা ভেরির জঙ্গল। যেদিকে চোখ যায় শুধু শূন্য প্রান্তরে ইতস্তত গাছপালা। মাঠ এবং গরিব মানুষের জন্য বসবাসের কিছু ঘরবাড়ি। কাঁচা রাস্তা। গোরুর গাড়ির কোঁ কোঁ আওয়াজ। সারাদিনে দু-চারটে গোরুর গাড়ি বহুদূর বিস্তৃত প্রান্তরে হারিয়ে যাবার জন্য হেলেদুলে যাত্রা করত। সকাল বেলাতেই কিছু সাইকেল আরোহীর আনাগোনা। ঝাঁকা মুটেওয়ালা আর মাছের ব্যাপারী কিংবা আড়তদারদের লোকজনের যাওয়া আসা চোখে পড়ত।

অথচ জায়গাটা বড়ো শহর থেকে দূরেও নয়। পাকা রাস্তা চলে গেছে এয়ারপোর্ট বারাসাত পার হয়ে। এয়ারপোর্ট যাবার ভি আই পি রাস্তাটাই আসলে যত গণ্ডগোল সৃষ্টি করে ফেলল। লোকজন শহরের কাছাকাছি জায়গায় নির্জন এলাকায় চলে আসতে থাকল। শহরের এঁদো গলি থেকে মুক্তি কে না চায়।

বিষয়ী লোকেরা নানা ধান্দায় ঘোরে। তিন-চারশো টাকায় বিঘা মিললে টাকা খাটাবারও সুরাহা হয়। জমি শুধু দেয়, নেয় না কিছুই। তারা ভালোই বোঝে।

তবে অহিভূষণ একটু অন্য ধরনের মানুষ। শহরে সামান্য চাকরি এবং বাড়ি ভাড়া তাকে তাড়া করত। মাথা গোঁজবার ঠাঁই নিয়ে দুশ্চিন্তা। কারখানার অবস্থাও ভালো না। শেষে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে না হয়! সুযোগ মতো তিন চার কাঠা জমি পেলে সে-ও কেনে। বন্ধু নগেনই বলেছিল, কাঠা চারেক জমি রেখে দে। আখেরে কাজে লাগবে।

বন্ধুর পরামর্শেই বলতে গেলে জমি কেনা, আর জমি যে মা লক্ষ্মী বছর দুই না ঘুরতেই সে তা টের পেয়ে গেল। ঘরবাড়ির নেশা কার না থাকে। কুসুম একটা স্কুলে চাকরি পেয়ে যাওয়ায় হাতে দু-পয়সা জমতেও থাকল। অহিভূষণকে বলতে গেলে বাড়ি করার নেশায় পেয়ে বসল। অফিস ছুটির পর বাড়তি কাজের সুবাদেও পয়সা আয় হতে থাকল। এবং দেখতে দেখতে সে তিন কামরার একখানা বসত বাটির মালিক হয়ে গেল। এমন পাণ্ডব বর্জিত এলাকায় তার বাড়িঘর, কারণ যতদূরেই চোখ যায় পাকা বাড়ির হদিশ মেলে না। বাগচিবাবু, সাহাবাবু ছাড়া কেউ ঘরবাড়ি বানাতে তখনো রাজি ছিল না। জমি কেনা-বেচা চলছে ঠিক, তবে তারা সবাই ফাটকাবাজ। জমির দর উঠলে বেচে দেবে। একমাত্র তারাই তাকে উৎসাহ দিত। মানুষজন হল সেই মশামাছির মতো। বুঝলেন, আপনাদের দেখলেই লোকে বাড়ি ঘর বানাতে সাহস পায়। বাড়িটা দোতলা হয়ে যাওয়ার পর অহিভূষণ লক্ষ্য করল, রাস্তার ধারে দু-চারটে সত্যি নতুন বাড়ি উঠছে। ওর ভালোই লাগত। মানুষজন মৌমাছির মতো। ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়ে, ভালো পেলে বসে যায়। আরও উত্তরে। জায়গাটা যে আর পাণ্ডব বর্জিত এলাকা থাকবে না সে ভালোই জানে। নিজেকে যথেষ্ট বিচক্ষণ ভাবতে ভালো লাগে। কথায় কথায় কুসুমকে খোঁটা দিতেও ছাড়ে না!

কী বুঝছ?

কী বুঝব আবার!

জমি দেখে তো ভিরমি খেয়েছিলে। অ মা তোমার কি মাথা খারাপ। কোমর জল। জমি কোথায়। এখন বুঝছ জমি কোথায়?

কুসুম অবশ্য জমিটা দেখে ভেঙেই গেছিল! ভি আই পি রোডে উঠে গুম মেরে ছিল। সত্যি টাকাটা বুঝি জলে গেল। জমিতে কুসুমেরও শেষ কপর্দক খরচ। তা বলে কোমর জলে তুমি জমি খুঁজতে গেলে!

তারও মনে হয়েছিল, জমি নিয়ে সে তো ফাটকা খেলতে বসেনি। জমি ফেলে রাখার জন্যও কেনেনি। মাথার উপর একটুখানি ছাদের আশায়ই তো জমি কেনা। সেই জমি জলের তলায় থাকবে। কুসুম রাগ করতেই পারে। সে কুসুমকে সেদিন কোনো বোঝ প্রবোধ দিতেও সাহস পায়নি। দুদিন বাদে বলেছিল, নগেন তো বলল, খাল কেটে মাটি তোলার সময় সস্তায় মাটি পাওয়া যায়। কত পুকুর ডোবা বুজিয়ে যাদবপুর এলাকায় দেখনি মানুষ ঘরবাড়ি বানিয়েছে। আমরাও না হয়.....না মানে নগেন বলছিল, সস্তায় সে মাটির ব্যবস্থা করে দেবে। শ-দুই টাকা বাড়তি খরচা, ঠিক করে ফেলব। জল আর থাকবে না। জমি ভরাট হয়ে যাবে।

ঠিক করেও ফেলল। তিন-চার বছরে, সে দোতলায় উঠে আসতে পেরেছে। একশো পাঁচ টাকা ইটের হাজার, তেরো টাকা সিমেন্টের বস্তা, সেগুন কাঠের কিউবিক ফুট পয়তাল্লিশ টাকা। বাড়ির জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে গেল। বাগচিবাবু দেখা হলে বলত কত দর নিচ্ছে।

অহিভূষণ বলত, আর বলবেন না একশো পাঁচ টাকা হাজার এক নম্বর ইট। তাও যদি এক নম্বর হত। কী করি বলুন! পাই কোথা। বাড়ি করতে গিয়ে জেরবার।

বাগচিবাবু চোখ বড়ো করে বলতেন, একশো পাঁচ টাকা। শোনা কথা। আমার সাহসে কুলোত না। আশি টাকা হাজার গছিয়ে দিয়ে গেল বলে বাড়ির কাজে হাত দিয়েছিলাম। কী যে হচ্ছে। আকাশ ছোঁয়া হয়ে গেল মশাই। বাড়ি আর কারও করতে হচ্ছে না।

অহিভূষণ মজা পেত। হোক। দাম বাড়ুক। তার বাড়িটা হয়ে গেলে যা খুশি দাম বাড়ুক। বছর বছর দাম লাফিয়ে বাড়ছে। এই তো দোতলা করার সময় ইটের দাম একশো ত্রিশ নিল হাজারে। গোবিন্দ বিল্ডার্স বলত আপনি পুরানো খদ্দের। ছাড়ি কী করে। বাজারে চল্লিশ উঠে গেছে।

যাহোক বাড়িটা তার মন্দ না। নীচে দুখানা শোবার ঘর। উপরেও তাই। সামনে ব্যালকনি। কাচ দিয়ে ঘেরা। সে রাতে বাড়ি ফিরলে ব্যালকনিতে বসলে, দূর প্রান্তে

গাছপালার ভিতর হাস্যকর আলো দেখতে পেত। তার ঘরে তখনো হারিকেন জ্বলে। গাছপালার ভিতর অন্ধকারে সেই হ্যাজাকের রহস্যময় আলোই একদিন কেন যে তার বাড়িটাকে আরও মহার্ঘ করে তুলল বুঝতে পারল না। অতদূরে কারা থাকে। সে দিনের বেলাতেও দেখেছে ওখানে একটা লাল রঙের ইটের বাড়ি। অনেকটা জায়গা নিয়ে মনে হয় বাড়িটা। সদর রাস্তা ভি আই পি থেকে নেমে কতদূর গেছে তার তখনো জানা হয়নি। তার বাড়িটা সদর রাস্তায় নয়। কিছুটা মাঠের ভিতর বলে, রাতে বড়োই নির্জন। কত রকমের সব পাখিরা উড়ে বেড়ায়। ঝোপে জঙ্গলে ডাহুক পাখির ছড়াছড়ি। রাতে ডাহুক পাখিরা কলরব তুললে আশ্চর্য এক ধবনি মাধুর্য সৃষ্টি হয়। শহরের বিষাক্ত বাতাস থেকে দূরে থাকার আনন্দও তার তখন কম না। শুধু খোলামেলাই নয়—একেবারে পরিত্যক্ত এলাকায় সে তার সুন্দর বাড়িটি তৈরি করে সুখেই ছিল। কুসুম, সে, বুড়ো জ্যেঠিমা, দুই কন্যা। ভি আই পি বেশি দূরও না। কুসুমের সঙ্গেই ইস্কুলে যায়। বাসে জায়গা পাওয়া যায়। বসেই যেতে পারে। এত সুখ তার। কুসুম তার বুদ্ধিবিবেচনার তারিফ করত তখন খুব।

ছুটির দিনেই হাতে সময়। সে বের হয়ে পড়ত। মাঠে আবার ইট পড়ছে। কার বাড়ি হচ্ছে! নাম ধাম, আলাদা সবই হয়ে যেত এক সময়। বাগজোলা ক্যাম্পের গরিব মানুষজন—সস্তাই মিলে যেত। ঠিকা কাজে লোক মিলত মেলা। সে হেঁটে যেত খাল বরাবর। ওপাশে সল্টলেকের ধূধূ প্রান্তর। শুধু বেনা ঘাস আর ভরাট জমি। দুটো একটা বাড়ি। বনেজঙ্গলে পাখির বাসায় সাদা ডিমের মতো পড়ে থাকত। একদিন সে আবিষ্কার করে ফেলল, লাল রঙের ইটের বাড়িটাও। হাঁটতে হাঁটতে সে তার বাড়ি ফেলে বেশ

অনেকটা দূরেই চলে এসেছিল। সেই গাছপালার ভিতর লাল রঙের বাড়িটা চোখে পড়তেই দ্রুত কেন যে হাঁটতে থাকল বুঝল না। আসলে রাতের সেই হ্যাজাকের আলোর নেশা। বাড়িটা রহস্যময়। কারা থাকে। কারা রাত হলে হ্যাজাকের আলো জ্বালায়! প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বিঘে জমি নিয়ে বাড়িঘর বানিয়ে কারা থাকে এই সবই ছিল রহস্য। দূর থেকেই বুঝেছিল বাড়িটায় নারকেল গাছের ছড়াছড়ি। আম জামও আছে। নিম গাছের ছায়াও পায় বাড়িটা। খালের বাঁধে বাড়িটা যে নীচু জমিতে তাও বোঝা গেল। গাছের ফাঁকে বিশাল সব খড়ের গাদাও চোখে পড়ত। লোকজন সাইকেল, বড়ো বড়ো টিনের ক্যান ঝুলিয়ে কাঁচা রাস্তায় নেমে সদর রাস্তায় চলে গেল।

কাছে যেতেই বুঝল, বাড়িটা জমির এক প্রান্তে। বড়ো বড়ো টানা প্ল্যাটফরমের মতো দু-চালা টিনের সেড। বিশ-বাইশটা জার্সি গোরু একদিকে। আর একদিকে বিশ-বাইশটা মোষ বাঁধা। চুনি ভূসির বস্তা থেকে টিনে বড়ো বড়ো করে নামাচ্ছে গো খাদ্য। একটা ছেলে, এদেরই কেউ হবে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে সুর তোলার চেষ্টা করছে। কাক শালিক টিয়া পাখির ঝাঁকও দেখতে পেল। মৌটুসি পাখিরা কিচির মিচির করছে। দেয়ালে ঝুমকো লতার নীল ফুলের ছড়াছড়ি। তার মনে হয়েছিল, আসলে বিষয়ী মানুষের কারসাজি—দুধের কারবারি—তা হোক, লোকটার রুচি আছে বলতে হবে। বাড়িটা ভারি সুন্দর দেখতে। গাছপালা নিয়ে তপোবনের মতো হয়ে আছে। বাঁধ ধরে হেঁটে গেলে বাড়িটার সবই চোখে পড়ে। যদিও ইঁটের পাঁচিল ঘেরা বাড়ি। খুব উঁচু পাঁচিল নয়—কোমর সমান। ইচ্ছে করলেই যে কোনো লোক দেয়াল টপকে বাড়িতে ঢুকে যেতে পারে। আর কিছুটা হেঁটে গেলেই লাল ইটের বাড়িটা সামনাসামনি। দুটো জামরুল গাছের ফাঁকে জানালাও

স্পষ্ট। ভিতরে সুন্দর একটি পালঙ্ক। এমনকী রাস্তা থেকে বড়ো দেয়াল জোড়া আয়নাও দেখতে পেল।

কারা থাকে?

কৌতূহল স্বাভাবিক।

পালঙ্কটি ময়ূরপঙ্ক্ষী নৌকার মতো যে নানা সাজে সজ্জিত রাস্তা থেকে বুঝতে তার আদৌ কষ্ট হল না!

বাড়িটা পার হয়ে যেতেই দেখেছিল সুন্দর একটি সরোবর। ঘাটটা বাঁধানো। চুল খুলে এক যুবতী সেখানে বসে আছে। শীতের বিকেলে রোদের উষ্ণতা মেখে নিচ্ছে গায়ে। কিংবা চুল শুকোচ্ছে।

কেন যে সহসা মনে হয়েছিল তার মতো রাজপুত্র রাজকন্যার গল্পে এমন নারীর দেখা পাওয়া যায়। সে এখানে কেন? সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটা ছাঁত করে উঠেছিল। মেয়েটি বোধ হয় তাকে দেখতে পেয়েছে। ত্বরিতে সে ঘাট থেকে উঠে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। এত চঞ্চল তার গতি যে পায়ে নূপুর থাকলে ঝম ঝম করে বেজেও উঠতে পারত। দেবী প্রতিমার মতো মুখ। বিশ বাইশ ত্রিশ যে বয়সেরই হোক—নারী নারীই।

তারপর অহিভূষণ আর দাঁড়ায়নি। বাড়ি ফিরে এলে কুসুম লক্ষ্য করেছিল, মানুষটি কেমন অন্যমনস্ক। সে অভিযোগ তুলেছিল, ছুটির দিনেও ঘুরে বেড়াও। রাত হয়ে গেল ফিরতে! মেয়েদের নিয়ে বসলেও তো পারো! একটারও পড়ায় মন নেই।

তা পাঁচ-সাত বছরের দুই মেয়ে তো সামান্য তরলমতি হবেই। পড়তে ভালো লাগবে কেন? শহরের এঁদো গলি থেকে এখানে উঠে আসায় মন ব্যাজার অবশ্য বছর না ঘুরতেই জায়গাটার মায়ায় তারাও জড়িয়ে গেল। পথ পাথালি, ঝোপ জঙ্গল, প্রজাপতি মানুষকে যে সহজেই জড়িয়ে ফেলে ছেলেদের দেখলে অহিভূষণ টের পেত। অফিস থেকে ফিরে তার তখন রোজ এক বাতিক। সে ব্যালকনির ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিত। হাত-মুখ ধুয়ে জামা-প্যান্ট ছেড়ে সেই যে বসত আর নড়ত না। চা জলখাবার কাজের মেয়েটা দিয়ে যেত। হারিকেন জ্বলত—এবং সামনে-উদাস মাঠে কখনো জ্যোৎস্না খেলা করে বেড়াত। আকাশে নীল হলুদ রঙের নক্ষত্ররা নাচানাচি করত—দূরে খাল পার হয়ে সবুজ এক যেন অরণ্য জেগে থাকত।

একটু খোলামেলা জায়গায় বাড়ি করে বসবাস করার আনন্দই আলাদা। গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজে কান ফুটো করে দিচ্ছে না। রাতের নিস্তব্ধতায় এক সবুজ অরণ্যভূমিতে শুধু হ্যাজাক জ্বলত। বড়ো দূর মনে হত। কেমন স্বপ্নের দেশ মনে হত তার। সেই ময়ূরমুখি পালঙ্কে, সাদা চাদরের বিছানা এবং বড়ো দেয়াল আয়নার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে।

চুল আঁচড়াচ্ছে।

চুল নীল। কোমর পর্যন্ত চুলের গোছা। কানে ইয়ারিং পরছে। মুখে প্রসাধন। তারপর কোনো গল্পের বই নিয়ে শুয়ে পড়েছে বিছানায়। পা তুলে দিচ্ছে। শাড়ি নেমে যাচ্ছে।

অথবা কখনো মনে হত অহিভূষণের জ্যোৎস্না রাতে ঘাটলায় বসে আছে। মেয়েটি। কী নাম, কী করে সারা দিন তার কাটে সব কিছুই যেন এক রহস্যে ভরা। পরখ অসহ্য ঠেকলে হয়ত রাতে সে সরোবরের ঠাণ্ডা জলে অবগাহন করতে নামে। চোখের উপর কেন যে অদ্ভুত দৃশ্য সব ভেসে উঠত, দেখতে পেত, খোঁপা বেঁধে, শক্ত করে ক্লিপ এঁটে দিচ্ছে। মেয়েরা রাতে চুল ভেজায় না। তবে সাঁতার কাটতেই পারে। দেখতে পেত সে তার শাড়ি সায়া ব্লাউজ ছেড়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে জলে নেমে গেছে। বাড়ির ওদিকটায় আর কেউ থাকে বলেও সে জানে না। গোরু মোষের জায়গাটা একেবারেই আলাদা। ভিতরের দিকে কারো ঢাকার হুকুম নাও থাকতে পারে।

নির্জন মাঠের বাড়িতে একা একা বসে এসব চিন্তার মধ্যে তার এক আশ্চর্য অনুভূতি খেলা করে বেড়াত।

আর মাঝে মাঝেই সেই অনুভূতির স্বপ্নভঙ্গ ঘটত। কখনো কুসুম ডাকত, কিগো খাবে না। ব্যালকনিতে চুপচাপ বসে আছ কখন থেকে? কখনো স্বপ্নভঙ্গ-বুকটা ধরাস করে উঠত। লরি ঢোকার শব্দ। তার হেডলাইট। ইট ফেলার শব্দ।

কাঠ পড়ছে। কাঠ কাটার শব্দ।

কোথাও ছাদের সেন্টারিং হচ্ছে, তার শব্দ।

কখনো লোহার বিম ফেলার শব্দ।

সে এখানে এসেই টের পেয়েছিল, এক এক ঋতুতে এক এক জাতের পাখি উড়ে আসে। লম্বা ঠোঁট নীলরঙের ডানা মেলে তার বাড়ির আম জাম গাছে এসে বসত কী সব পাখি, জল পায়রা না বুনো হাঁস! সে পাখি বড় একটা চেনে না। বইয়ে পড়ে পাখির খবর রাখে, ডাহুক, গাঙশালিক, কাকাতুয়া, পায়রা ছাড়া আর কিছু বা পাখি আছে সে চিনতে পারে। সে তো হিমেল শীতের দেশ থেকে পাখিদের আসতে কখনো দেখেনি। ময়ূর কিংবা চড়াই পাখিও সে চেনে। কিন্তু চেনে না বুনো হাঁসেরা কী রকম হয়।

মেয়েটা বুনো হাঁস না জলপিপি। জলপিপি হোক বুনো হাঁস হোক, তার কিছু আসে যায় না। সুযোগ পেলেই সে অপরাহ্ন বেলায় বাঁধ ধরে হেঁটে যেত।

সেই অপরাহ্ন বেলা তার জীবনেও চলে আসবে একদিন জানত না। মেয়েদের বড়ো করতে গিয়ে, সে যখন বুঝল তার চারপাশ সত্যি দমবন্ধ হয়ে আসছে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাবার পর বাড়িটাও খালি হয়ে গেল। এক সন্ধ্যায় সে দেখল দূরের সেই রহস্যময় বাড়িটাও চোখের উপর থেকে হারিয়ে গেছে। সে নিজেও টের পায়নি। মধ্যে আর ফাঁকা

জায়গা নেই। সর্বত্র ইটের জঙ্গল।—কখন কবে কীভাবে চোখের সামনে এত ঘরবাড়ি উঠে গেল তার খেয়ালই নেই। কুসুম আর তার দুই মেয়েকে সুখে রাখতে গিয়ে সে নিজেই জানে না সে সব হারিয়েছে। তারপর একদিন কাজ থেকে অবসরের পালা। বাড়ি ফিরে এল সন্ধ্যায় পর। মনে হল তার বাড়িটাও অন্ধকার হয়ে আছে। বাড়িতে কেউ আজ আলো জ্বালেনি। কুসুম শুয়ে আছে তার অন্ধকার ঘরে। চারপাশের ঘরবাড়ির জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বাড়ি ঢোকার সময় মনে হল, সেই এক অন্ধকার গলি। পচা ভ্যাবসা গন্ধ নর্দমার। রাস্তা নেই-জল নিকাশি নালা নেই। কিংবা ঝম ঝম করে কোথাও কেউ পায়ে মল বাজিয়ে অদৃশ্য হয়েও যাচ্ছে না।

বিশ-পঁচিশ বছরে জায়গাটা কত বদলে গেছে, আজই যেন টের পেল। কুসুম দরজা খুলে দিলে, তাকে আজ ভারি অবসন্ন দেখাল। কুসুম আলো জ্বেলে দিয়ে দেখল, মানুষটা তার যেন সর্বস্ব হারিয়েছে।

কুসুম খাবার টেবিলে বলল, কী হয়েছে বলত! সারাজীবন কেউ চাকরি করে? অবসর তো একসময় নিতেই হয়।

অহিভূষণ ভাত নাড়াচাড়া করার সময় বলল, সারাটা দিন কাটবে কী করে। কোথায় বসব। বাড়ির চারপাশে এক বিন্দু সাধ নেই। খোলা আকাশ নেই। পাখিরা কোথায় সব চলে গেছে। সেই অন্ধকার গলির বাসিন্দা।

কুসুম মানুষটার কষ্ট বুঝতে পেরে বলল, অভ্যাস হয়ে গেলে আর খারাপ লাগবে না।

আর সকাল বেলাতেই মনে হল, আরে সেই রহস্যময় বাড়িটার খোঁজে গেলেও তো হয়। সে তো তাকে আরও কতবার দেখেছে। বাস রাস্তায় দেখেছে। চোখ তুললেই দেখতে পেত মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়ে গেলে নামিয়ে নিত। লজ্জায়, না, চুরি করে গাছের আড়াল থেকে মেয়েটিকে ঘাটলায় দেখার জন্য—সে বুঝতে পারত না। ভারি লক্ষ্মীশ্রী মুখ। বাড়িটা কখন যে দালান কোঠার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, সে টেরও পায়নি। কত বছর আগের কথা।

সে বাড়িটার খোঁজে সকালে বের হবার মুখে কুসুম বলল, কোথায় যাচ্ছ? সে কী বলবে কুসুমকে বুঝতে পারছে না। সকালে তো বাজার যায়, এছাড়া সকালে কোথাও যায় না গেলেও কোথায় যাচ্ছে বলে যায়। অথচ আজ কুসুমকে বলতে পারল না, তাকে খুঁজতে যাচ্ছি!

তাকে? সে কে?

সে যে কে বলে কী করে! সে যে কে নয়, সে যে তার কাছ থেকে বিশ-বাইশ বছর হরণ করে নিয়েছে বোঝায় কী করে।

বিশ-বাইশ বছরে জায়গাটা কত বদলে গেছে কুসুম কী টের পায় না! বিশ বাইশ বছর মানুষের জীবনে কত বড়ো ফারাক সৃষ্টি করে কুসুম কী জানে না!

বাড়িটা করার সময়, চারপাশে মাঠ। দূরে ওই লালরঙের বাড়িটা ছাড়া। আর তো কোনো লোকালয় ছিল না।

সে ব্যালকনিতে বসে দেখত সব।

বাড়ির ঠিক পাশে জলা জমি, ঝোপ জঙ্গল সবুজ মাঠ, গাছপালাও কম ছিল না। বাঁশের বন, এবং শীতের সময় উড়ে আসত অজস্র পাখি। জলা ভূমি, ডোবায়, ঝোপে জঙ্গলে তারা করব করত।

ডোবার জঙ্গলে এক জোড়া ডাহুক পাখিও সে আবিষ্কার করেছিল। সে বাড়ি তৈরি করে যখন আসে তখন তো তাদের ছানাপোনা, এঁটো-কাটা খেতে বাড়িতেও ঢুকে যেত। মধ্যরাতে ডাহুকের কলরব, জ্যোৎস্নায় মাঠঘাট ভেসে গেলে সে উঠে গিয়ে বসত ব্যালকনিতে। ডাহুকের কলরবের মধ্যে থাকত এক আশ্চর্য মিউজিক, যে মধ্যরাতে জ্যোৎস্নায় টের পায়নি ডাহুকের কলরব সে জানেই না জীবন কত আশ্চর্যের সব সমষ্টি।

সেই ডাহুকের কলরব নেই। কোথায় যে গেল তারা!

সেই শীতের পাখিও আর আসে না।

শুধু ইট কাঠ আর মানুষ জন, রাস্তায় হাঁটা যায় না। দোকান পাট, বড়ো বড়ো বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট, গাড়িতে সুন্দর সুন্দর বালিকারা স্কুলে যায়, দম্পতিরা গাড়ি করে ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢুকে যায়, তারা জানেই না এই এলাকার একজন মানুষ পৃথিবীর তাবৎ সৌন্দর্য নিয়ে নির্জন নিরালার খোঁজে এখানে এসে উঠেছিল। আসলে সে যাচ্ছে সেই নির্জনতার খোঁজে।

মাঠ পার হয়ে খালধার ধরে অনেকটা হেঁটে গেলে সেই বাড়ি। সেখানে সে ঘাটলায় আবিষ্কার করেছিল, আর এক কুসুমকুমারীকে। কুসুমকুমারীর খোঁজে সে যাচ্ছে। কুসুমকে সে বলবে কী করে, গোপনে এই প্রকৃতির সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে গিয়ে আর এক কুসুমকুমারীকে আবিষ্কার করে ফেলেছিল। বিশ-বাইশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া, বিশ-বাইশ বছর না তারও কম এখন ঠিক হিসাবে খুঁজে পায় না। আসলে কোনো অতীতে যেন সে তাকে আবিষ্কার করেছিল। কুসুমের গলায় ঝাঁজ।

কোথায় যাচ্ছ বলবে না?

আরে এখন মেলা সময় হাতে। কাজ কাম সব শেষ। ঘুরে দেখতে। এতদিন সময় পাইনি।

তাই বলে সক্কাল বেলায়।

আসলে সে বোঝায় কী করে, তার অখণ্ড অবসরই পাগল করে দিয়েছে তাকে। জীবনের ব্যস্ততা হারিয়ে গেলে সব যে শেষ। কুসুমকে বোঝায় কী করে। সে নতুন জীবনের খোঁজে আছে।

তাকে তো সময় কাটাতে হবে।

বন্ধুবান্ধবও নেই বিশেষ। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক আলগা হয়ে গেছে। কুসুম আর তার মেয়েদের সামলাতে গিয়ে কখন সম্পর্কহীন হয়ে গেছে সে নিজেও জানে না।

যদি সেই বাড়িটার খোঁজে, বের হয়ে পড়তে পারে দেখা যাক না, এটাও তো আবিষ্কারের সামিল হয়ে যাবে। কার বাড়ি, কে করল, কোথায় আগে তারা থাকত, লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারলে বেঁচে যেতে পারে। সে বলল, খাল ধারে ঘুরে আসি।

এত বেলায়!

কুসুম যেন মানুষটাকে চিনতে পারছে না। কী করে সে!

তা হলে বলছ বিকেলে বের হতে।

কুসুম বলল, বিকেলে খালের ধারে বেড়াতে যাবার কী হল!

ভি আই পি ধরে ঘুরে এস না! ভালো লাগবে। সেই গাড়ি-ঘোড়া!

আরে গাড়ি-ঘোড়াই তো মানুষকে ছুটিয়ে নিচ্ছে বোঝো না!

তা ঠিক। জায়গাটা কী হয়ে গেল!

আপশোষ।

সকালে পারল না। তবে বিকেলে সে বাড়িটার খোঁজে বের হয়ে গেল। খালের ধার ধরে হেঁটে যেতে থাকল। এখানটায় ছিল একটা অশ্বথ গাছ, এখানটায় বাঁশের জঙ্গল, এখানটায় জলাজমি, এখানটায় সবুজ মাঠ। কিন্তু এত বড়ো বড়ো অ্যাপার্টমেন্ট, টেনিস র‍্যাকেট হাতে বালিকার লন পার হয়ে যাওয়া, সাদা ফ্রক, আর কি সুঠাম শরীর—কেউ না কেউ দেখছে, সে যেমন দেখত বিশ-পঁচিশ বছর আগের সেই কুসুমকুমারীকে। সামনে সব সরকারি ফ্ল্যাট, কো অপারেটিভ করে বাড়িঘর—যতদূর চোখ যায় মানুষের জঙ্গল। সে অনেক খুঁজল। কিন্তু সেই কুসুমকুমারীর বাড়িটা আবিষ্কার করতে পারল না। জার্সি গোরু, একটি ছেলের খড়ের গাদায় শুয়ে বাঁশি বাজানো, হাক ডাক, দুধের ক্যানেস্তারার ঠনঠন শব্দ কোথাও কান পেতে শুনতে পেল না। ঘাটলাও নেই। কিছুই সে

খুঁজে পেল না। তবু কী যে হয় তার, বাড়ির এই রহস্য, কিংবা হারিয়ে যাওয়ার রহস্যের খোঁজেও যদি সে ব্যস্ত থাকে তবে তার আর অখণ্ড সবারই যে একটা রহস্যময় বাড়ি দরকার। খুঁজে দেখা যাক না ঠিক কোথায় সেই বাড়িটা ছিল।